ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৫ম সংখ্যা, শ্রাবণ ১৪২৫

আহমদ ছফার *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন*: প্রসঙ্গ কথ্যভাষা

*মোহাম্মদ আব্দুর রউফ

সারসংক্ষেপ: মনের ভাব প্রকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হলো ভাষা। আমরা কখনো বলে মনের ভাব প্রকাশ করি। আবার কখনো লেখে মনের ভাব প্রকাশ করি। তাই সাধারণভাবে ভাবপ্রকাশের দুটি রীতির কথা বলা হয়ে থাকে। একটি লেখ্যরীতি, আর একটি কথ্যরীতি। যারা অশিক্ষিত, তারা সাধারণত কথ্যরীতিতে ভাবের আদান-প্রদান করে থাকে। আবার শিক্ষিতরাও কখনো-সখনো দীর্ঘদিনের অভ্যাসের কারণে বা ঘরের মধ্যে কথ্যভাষায় মনের ভাব প্রকাশ করে থাকে। এতে ভাষার মধ্যে সাবলীলতা আসে। কথ্য ভাষা এক ধরণের সমাজভাষা। সমাজের মানুষকে নিয়ে সাহিত্য রচিত হয়। তাই সঙ্গতকারণেই সাহিত্যের মধ্যে কথ্য ভাষার প্রয়োগ ব্যাপকভাবে লক্ষ করা যায়। আহমদ ছফা একজন গুরুত্বপূর্ণ কথাসাহিত্যিক। তাঁর সাহিত্যকর্মে কথ্যভাষার প্রচুর প্রয়োগ রয়েছে। *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* আহমদ ছফার একটি অন্যতম উপন্যাস। আলোচ্য প্রবন্ধে এই উপন্যাসের কথ্যভাষার বিশ্লেষণ ও স্বরূপ সন্ধানের প্রয়াস লক্ষ করা যাবে।

ভাষার মাধ্যমে মানুষ নিজেকে বিকশিত করে। 'সৃষ্টিকর্তার অসাধারণ দান এই ভাষা।'[১] এ কথা সবাই স্বীকার করেন যে, 'ইন্দো-ইউরোপীয় পৃথিবীর সবচেয়ে বিখ্যাত ভাষাবংশ।'[২] এই ভাষাবংশের শতম শাখা থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। এ কথা বলা যায় যে, বাংলা ভাষার বয়স হাজার বছরের বেশি। তবে জন্মলগ্নে বাংলা ভাষা এখনকার মতো এতো সুশৃঙ্খল ছিল না। ভাষাবিদ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ এর মতে গৌড়ীয় প্রাকৃত থেকে বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে। সমকালীন সময়ে সাধারণ মানুষের মুখের ভাষাই প্রাকৃত ভাষা নামে পরিচিত ছিল। তারপর আস্তে আস্তে বাংলা ভাষার বিকাশযাত্রা অব্যাহত থাকে। এক সময়ে কলকাতার কথ্যভাষাকে কেন্দ্র করে মানভাষা গড়ে ওঠে। এই ভাষাই হয়ে যায় সাহিত্যের ভাষা। সব মানুষ সাহিত্যের ভাষায় কথা বলে না। কিন্তু সব মানুষই সাহিত্যের উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। তাই তাদের ব্যবহৃত অঞ্চলভিত্তিক কথ্যভাষাও সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। সাহিত্যের প্রত্যেকটি শাখায় আঞ্চলিক ভাষার ব্যবহার রয়েছে। এতে সাহিত্যের মান সমৃদ্ধ হয়েছে। আঞ্চলিক ভাষা থেকেই ক্রমান্বয়ে পরিশীলিত হয়ে সৃষ্টি হয়েছে প্রমিত বাংলা। আর আঞ্চলিক কথ্যভাষাতেই ভাষার প্রাণ লুকিয়ে থাকে। ভাষাবিদের মতে,

> নিজ নিজ আঞ্চলিক ভাষায় কথা বলতে পারা তো গর্বের বিষয়ই। এ ভাষা যে নিজের মায়ের ভাষা। মায়ের ভাষার ওপর অধিকার সে তো জন্মগত অধিকার। যে যেই অঞ্চলের মানুষ তার কাছে সেই অঞ্চলের আঞ্চলিক ভাষা পরম মমতার ধন। হোক সে ধনী অথবা নির্ধন, ছোট অথবা বড়, উঁচু অথবা নিচু।[৩]

ঢাকা ঐতিহ্যমণ্ডিত একটি প্রাচীন নগরী। এই নগরীতে চার বার বাংলার রাজধানী স্থাপিত হয়েছে। ইতোমধ্যে ঢাকার বয়স চারশত বছর পেরিয়ে গেছে। ঐতিহ্যগতদিক থেকে এবং সংস্কৃতিগতদিক থেকে এই ঢাকা নগরী বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ইতিহাসের ভাষ্যে-

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, সরকারি এডওয়ার্ড কলেজ, পাবনা।

> 'ইসলাম খাঁ চিশতি ১৬০৮ (মতান্তরে ১৬১০) সালের জুলাই মাসে ঢাকা পদার্পণের পূর্বে, ঢাকা শহরের একটি ক্ষয়িষ্ণু কাঠামো হয়তো ছিল কিন্তু তার কোন বৈভব ছিল না। বাবু বাজারের দোলাইখালের পূর্ব প্রান্ত থেকে পূর্বে ফরিদাবাদ পর্যন্ত শহরভিত্তিক জনবসতি বিদ্যমান ছিল। এ অঞ্চলের মানুষেরা স্থানীয় 'ঢাকা ভাষা'য় কথা বলতো। তাদের কথ্য ভাষার সাথে বুড়িগঙ্গার দক্ষিণপাড় জিঞ্জিরা-কেরানিগঞ্জ, পূর্বে ডেমরা-মাতুয়াইল, পশ্চিমে নবাবগঞ্জ-হাজারীবাগ, রায়েরবাজার, বশিলা, মিরপুর, আমিনবাজার ও উত্তরে মগবাজার-তেজগাও অঞ্চলের আদি বাংলাভাষী ঢাকাইয়াদের ভাষার সাদৃশ্য ছিল। অর্ধ সহস্রাব্দের পরিক্রমায় এর প্রমাণ এখনো লুপ্ত হয়ে যায় নি।'[৪]

আদি ঢাকাবাসীদের ভাষাই 'ঢাকাইয়া বাংলা ভাষা' বা ঢাকার উপভাষা বলে খ্যাত। সাধারণত আমরা কথায় কথায় একে পুরান ঢাকার ভাষা বলি। এই ভাষা অত্যন্ত সমৃদ্ধ ও শ্রুতিমধুর। ঢাকার উপভাষা সম্পর্কে রোকেয়া ইউসুফ বলছেন-

> 'ঢাকার এই উপভাষাটি বাস্তবিক অর্থে খুবই চমৎকার একটি ভাষা। একে অন্তর দিয়ে অনুভব করলে দরদ দিয়ে পর্যালোচনা করলে বোঝা যাবে এর মর্ম, এর গুরুত্ব। ভাষা হিসেবে এটি অনেক উঁচুমানের একটি ভাষা। বাংলাদেশের সবগুলো আঞ্চলিক ভাষার উপরে এর স্থান। এই ভাষা আমাদের ইতিহাস এই ভাষা আমাদের ঐতিহ্য।'[৫]

ঢাকায় বসে যারা সাহিত্যকর্ম সৃষ্টি করেছেন, তাদের লেখায় আমরা এই উপভাষার প্রভাব ব্যাপকভাবে লক্ষ্য করি। আহমদ ছফা ষাটের দশকের লেখক। তিনি মোট আটটি উপন্যাস রচনা করেছেন। তন্মধ্যে *'একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন'* (১৯৮৮) একটি অন্যতম উপন্যাস। এই উপন্যাসে আহমদ ছফা পুরান ঢাকার কথ্যভাষার সফল প্রয়োগ ঘটিয়েছেন। আমরা উপভাষাতেই স্বাভাবিক জীবন পেয়ে থাকি। এ প্রসঙ্গে ম্যাক্সমুলার বলেছেন 'The real and natural life of language is in its dialect'.[৬] অর্থাৎ উপভাষাগুলোতেই প্রকৃতপক্ষে স্বাভাবিক জীবন রয়েছে। আহমদ ছফা সাহিত্যকর্মে স্বাভাবিক জীবন তুলে আনবার চেষ্টা করেছেন। তাই তাঁর নির্মিত চরিত্রে প্রায়ই কথ্যভাষা বহমান নদীর মতোই প্রবাহিত হয়েছে। 'কোনও স্থানের খাঁটি উপভাষা জানিতে হইলে সেই স্থানের অশিক্ষিত জনসাধারণের ভাষাকে অবলম্বন করিতে হইবে।'[৭] আহমদ ছফাও সেই কাজটি করেছেন। আলি কেনানের মুখে খাঁটি উপভাষা তুলে দিয়েছেন। আলি কেনান টেবিলে একটা থাবা দিয়ে বেশ গম্ভীর স্বরে উচ্চারণ করে বসল-'দে তোর বাপরে একটা ট্যাহা দিয়া দে।'[৮] এটি একটি অনুজ্ঞাবাচক বাক্য। এখানে 'বাপরে' ও 'ট্যাহা' শব্দ দুটিতে ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে। 'ক' ধ্বনির পরিবর্তে যথাক্রমে 'হ' ও 'ট' ধ্বনি ব্যবহৃত হয়েছে। 'অ্যা' ধ্বনি সংযুক্ত হয়েছে। 'প্রাচীন ও মধ্য বাঙলায় সম্ভবত অ্যা ধ্বনিটি ছিল না। এটি একটি আধুনিক বাঙলা ধ্বনিমূল।'[৯]

সবার কথ্যভাষা এক রকম নয়। সামাজিক অবস্থা, শিক্ষার অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা ও পরিবেশগত ভিন্নতার কারণে কথ্য ভাষা ভিন্ন হয়ে যায়। প্রাবন্ধিকের মতে–

> 'বাংলা ভাষা ব্যবহারের ক্ষেত্রে সামাজিক স্তর বিন্যাসের প্রভাব স্পষ্ট চোখে পড়ে। উচ্চবিত্ত, মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত-এ তিন অর্থনৈতিক শ্রেণির ব্যবহৃত ভাষায় ভিন্ন ভিন্ন রূপ দেখা যায়। সামাজিক অবস্থানের কারণেও ভাষাগত পার্থক্য দেখা যায়। শিক্ষাও এ

ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। অর্থনৈতিক মাপকাঠিতে উচ্চ অবস্থানে থাকা সত্ত্বেও শিক্ষাক্ষেত্রে অনগ্রসর শ্রেণির ভাষা আর অভিজাত ও শিক্ষিত সমাজের ভাষা এক রকম নয়।'[১০]

তাই দেখা যায় নানা কারণে কথ্য ভাষায় ধ্বনিগত পরিবর্তন ঘটে যায়। এই পরিবর্তন বিভিন্ন কারণে বিভিন্ন রীতিপদ্ধতিতে হয়ে থাকে। আহমদ ছফার *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* গ্রন্থে সব চরিত্রই সমাজের নিম্নবর্গের। তাই তাদের কথ্যভাষায় নানাভাবে ধ্বনি পরিবর্তন ঘটতে দেখা যায়।

অপনিহিতি এবং অভিশ্রুতি

অপনিহিতি এবং অভিশ্রুতি অনেকটা কাছাকাছি ধ্বনি পরিবর্তন পদ্ধতি। আহমদ ছফার *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* গ্রন্থে কথ্য ভাষায় অপনিহিতি এবং অভিশ্রুতির মাধ্যমে ধ্বনি পরিবর্তন হয়েছে। 'অপনিহিতি' অভিধাটি সম্পূর্ণ সংস্কৃত ভাষাসংশ্রিষ্ট তথা ভারতীয়। ড: সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি অনুয়ায়ী :- "'শব্দের মধ্যে 'ই' বা 'উ' থাকলে সেই 'ই' বা 'উ' আগে থেকেই উচ্চারণ করে ফেলবার রীতির নামকরণ হয়েছে অপনিহিতি।"[১১] ধ্বনি পরিবর্তনের এই প্রক্রিয়ায় স্বরধ্বনি 'ই' বা 'উ' উচ্চারণের সময় নিজের স্থান পরিবর্তন করে আগে চলে আসে। অপনিহিতি ই বা উ যদি লুপ্ত হয় বা সহচর স্বরের সহযোগে নতুন রুপ পায়, তবে তাকে বলে 'অভিশ্রুতি'"।[১২]

একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন গ্রন্থে কথ্য ভাষায় অপনিহিতি ও অভিশ্রুতির প্রয়োগ:

সাধু ভাষা	কথ্যভাষা	অপনিহিতি	অভিশ্রুতি
লাগিয়া	লাইগ্যা	লাই-গিয়া	লেগে
কাটিয়া	কাইট্যা	কাই-টিয়া	কেটে
ভরিয়া	ভইর‍্যা	ভই-রিয়া	ভরে
ধরিয়া	ধইর‍্যা	ধই-রিয়া	ধরে
উঠিয়া	উইঠ্যা	উই-ঠিয়া	উঠে
ভাঙ্গিয়া	ভাইঙ্গ্যা	ভাইঙ্গ-গিয়া	ভেঙ্গে
কাটিয়া	কাইট্যা	কাই-টিয়া	কেটে
থাকিয়া	থাইক্যা	থাই-কিয়া	থেকে
ঘুরিয়া	ঘুইর‍্যা	ঘুই-রিয়া	ঘুরে
চলিয়া	চইল্যা	চই-লিয়া	চলে
লেখিয়া	লেইখ্যা	লেই-খিয়া	লেখে
পুতিয়া	পুইত্যা	পুই-তিয়া	পুতে
হাসিয়া	হাইস্যা	হাই-সিয়া	হেসে

উপর্যুক্ত ছকটিতে দেখা যাচ্ছে, কথ্য ভাষায় ধ্বনিগত পরিবর্তন হয়েছে। 'এই শ্রেণির ধ্বনি পরিবর্তনে রূপমূলের মধ্যে অতিরিক্ত একটা স্বরধ্বনি সংযুক্ত হয়।'[১৩]

কথ্যভাষায় অপশব্দের বহুল প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। আবার অনেক অপশব্দই কৃত্রিমভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে। এই সব অপশব্দকে সমাজ ভাষাবিজ্ঞানে অশিষ্ট শব্দ বা ইতর শব্দ বলা হয়ে থাকে। "অশিষ্ট শব্দের মধ্যে শরীরের অনেক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং অবৈধ সম্পর্ক নির্দেশক শব্দও দেখা যায়। এ কারণে অপশব্দগুলি প্রায়শ অশিষ্ট রীতির হিসেবেই বিবেচিত হয়। এগুলো সহিংসতা, অপরাধ, মাদক এবং যৌনতা সম্পর্কিত হতে পারে।"[১৪] আহমদ ছফার *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* _গ্রন্থের নায়ক চরিত্র একজন কেনান আলি। সে দরবেশ সেজেছে। অনেক অসহায় মহিলা আলি কেনানের কাছে আধ্যাত্মিক চিকিৎসার জন্য আসে। কেনান আলি এ সময় অনেক রকম অশ্লীল শব্দের গালাগালির তুবড়ি ছুড়তে থাকে। যেমন : 'খানকি মাগি, শাউরের পো, নে মাগি এইড্যা খা, যে বালক বিছানায় প্রসাব করে তাকে একটা গ্লাসে ডান হাত ডুবিয়ে পানিটা মুখের কাছে ধরে বলে, নে বানচোত এই পানি খা। আবার বিছানায় মুতলে শালা লেওড়া কাইট্যা ফেলুম মনে রাখিস।'[১৫] একজন জোয়ান পুরুষ স্ত্রীর বিশ্বাস ভঙ্গের অভিযোগ নিয়ে আসলে আলি কেনান বলে- 'শালা তর হাতিয়ারে জোর নাই। কবিলা তরে কেয়ার করব কেরে? হের হাউস নাই? পুরুষের একশ'ছ গুণ, মাইয়া মানষের ন'গুণ।'[১৬] ছমিরন নামের একজন অসহায় মহিলা আলি কেনানের মাজারে আশ্রয় প্রার্থনা করে। আলি কেনানকে 'বাবা' বলে সম্বোধন করে। কিন্তু এই শ্রদ্ধার ডাক আলি কেনান পছন্দ করে নি। বরং আলি কেনান অশ্লীল কথ্যভাষায় মহিলাকে বলে-

> মাগি তামাসা রাখ। কি অইছে হেইডা ক। মাগি তর লাঙ ঢুকাইবার স্বভাব আছে? কওন যায় না মাগিগো লগে শয়তান ঘুইর‍্যা বেড়ায়।... যা অই ঘরটাতে থাক গিয়া। খবরদার লাঙ লুঙ ঢুকাইলে শাউয়ার মধ্যে তাজা আণ্ডরা হান্দাইয়া দিমু।[১৭]

এইভাবে দেখা যায়, নায়ক চরিত্র একটি মাজারের সাধু দরবেশ হয়েও লিবিডো তাড়নায় ছটফট করেছে এবং যৌনতা সম্পর্কিত অনেক অশ্লীল শব্দ অবলীলায় বলে যাচ্ছে। যেমন : শালা, লেওড়া, খানকি মাগি, শাউরের পো, বানচোত, লাঙ-লুঙ, ঢুকাইবার, শুয়োরের বাচ্চা, খানকির পোলা, শাউরের পুত, লাগাইব, সহবাস, হায়েজ নেফাজ, মাইয়া, বুনি, পাছা, কাপড় খুইল্যা দেখ, গাঙ বানাইয়া দিছে ইত্যাদি। এ রকম ইতর ভাষা কেবল কথ্যভাষাতে রয়েছে। বিশেষ অঞ্চলে বিশেষ শব্দ প্রচলিত। ভাষা ব্যবহারে মানুষের সহজাত শক্তি আছে। 'সে আয়ত্ত করে সেই ভাষাটি, যে ভাষাসমাজে সে জন্ম নেয়।'[১৮] আলি কেনান নিজস্ব অঞ্চলের কথ্যভাষা এখানে প্রয়োগ করেছে।

স্বরধ্বনির পরিবর্তন

চলিত ভাষা	কথ্যভাষা	ধ্বনি পরিবর্তন
ঝাল	ঝালা	অ ধ্বনি আ তে পরিবর্তন।
ঢুকাবার	ঢুকাইবার	আ ধ্বনি ই তে পরিবর্তন।
বিয়ে	বিয়া	এ ধ্বনি আ ধ্বনিতে পরিবর্তন।

কোনো	কুনু	ও ধ্বনি উ ধ্বনিতে পরিবর্তন।
দেব	দিব	এ ধ্বনি ই ধ্বনিতে পরিবর্তন।
পাইবে	পাইবা	এ ধ্বনি আ ধ্বনিতে পরিবর্তন।
পারবে	পারবা	এ ধ্বনি আ ধ্বনিতে পরিবর্তন।
যাবে না	যাবি না	এ ধ্বনি ই তে পরিবর্তন।
এমন	এমুন	ও ধ্বনি উ ধ্বনিতে পরিবর্তন।

ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন

চলিত ভাষা	কথ্যভাষা	ধ্বনি পরিবর্তন
কথা	কতা	থ ধ্বনি ত ধ্বনিতে পরিবর্তন
সকলে	হগলে	স ধ্বনি হ ধ্বনিতে এবং ক ধ্বনি গ ধ্বনিতে পরিবর্তন
কিসের	কিয়ের	স ধ্বনি য় ধ্বনিতে পরিবর্তন।
দেখি	দেহি	খ ধ্বনি হ ধ্বনিতে পরিবর্তন।
সাঁঝবেলা	হাঁঝবেলা	স ধ্বনি হ ধ্বনিতে পরিবর্তন।
মুখে	মুহে	খ ধ্বনি হ ধ্বনিতে পরিবর্তন
থাকে	থাহে	ক ধ্বনি হ ধ্বনিতে পরিবর্তন।
মানুষটি	মানুষডি	ট ধ্বনি ড ধ্বনিতে পরিবর্তন।
ভাইজানকে	ভাইজানরে	ক ধ্বনি র ধ্বনিতে পরিবর্তন
সাবকে	সাবরে	ক ধ্বনি র ধ্বনিতে পরিবর্তন

দ্বিত্ব শব্দের প্রয়োগ

প্রথাগত ব্যাকরণে দ্বিত্ব শব্দ নির্মাণের একটি বিশেষ উপায়। "তা সাধারণভাবে ভারতীয় ভাষাগুলিরই একটি লক্ষণ, এবং এই দ্বিত্বের (কখনও-বা 'বহুত্বের') দ্বারা নানা বিচিত্র অর্থ প্রকাশিত হয়ে তাকে।"[১৯] বাংলা ভারতবর্ষের একটি অন্যতম ভাষা। মান ভাষার চেয়ে কথ্য ভাষায় দ্বিত্বের প্রয়োগ আরো বেশি। 'প্রথম শব্দটির আরম্ভের ব্যঞ্জনটি পরের প্রতিধ্বনি জাতীয় শব্দে ট-এর দ্বারা স্থানচ্যুত হয়।'[২০] যেমন তামুক-টামুক, জখম-টখম, চল্লিশ-টল্লিশ। আহমদ ছফার *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* গ্রন্থে বৈচিত্র্যময় দ্বিত্বের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। যেমন : গোস্বা-টোস্বা, হাইস্যা-হাইস্যা, কানতে-কানতে, শুক্রবার, চউকে-চউকে, হপ্তায়-হপ্তায়, খিলখিল, টিমটিম ইত্যাদি।

ক্রিয়াপদ ও কালের প্রয়োগ

বর্তমানকালের প্রয়োগ: আসছি (চলিত ভাষা), আইছি (কথ্যভাষা), স > ই ধ্বনিতে পরিবর্তন।

ঘটমান বর্তমানকালের প্রয়োগ: পাইতেছি (চলিত ভাষা) পাইতাছি (কথ্যভাষা) এ > আ ধ্বনিতে পরিবর্তন।

প্রযোজক ক্রিয়াপদ

দেখাইতেছি (চলিত ভাষা), দেহাইতাছি (কথ্যভাষা), 'যেহেতু প্রযোজক ধাতুই আ-অন্তক, সেহেতু তাদের ক্রিয়ারূপ অধিকাংশত Ca- ধাতুর মতোই হবে।'[২১] এখানে খ > হ তে পরিবর্তন হয়েছে এবং এ > আ ধ্বনিতে পরিবর্তন হয়েছে।

কথ্যভাষা নানা কারণে গুরুত্বপূর্ণ। কথ্যভাষার বক্তার সাথে বিশেষ অঞ্চলের সামাজিক সম্পর্কসহ অনেক কিছু জানা যায়। "বক্তার ভাষা থেকে তার পরিচয় এবং তিনি যে সামাজিক গোষ্ঠীর অন্তভুর্ক্ত, সেই গোষ্ঠীর পরিচয় পাওয়া যায়। কোনো ভাষাভাষীর সামনে অনেকগুলো ভাষিক রূপ থাকতে পারে। সার্থক মিথস্ক্রিয়ার জন্য তিনি প্রয়োজনীয় রূপটি গ্রহণ করেন।"[২২] আহমদ ছফার *একজন আলি কেনানের উত্থান-পতন* গ্রন্থের নায়ক আলি কেনান কথ্যভাষার প্রয়োজনীয় রূপটি বেছে নিয়েছে। এই ভাষার মধ্য দিয়ে আলি কেনানের শিক্ষা-দীক্ষা, সামাজিক অবস্থান ও পেশাগত বা গোষ্ঠীগত পরিচয় কিছুটা হলেও বোঝা যায়। বিলাত-ফেরত মহিলা ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুকে নিয়ে দরবেশ বাবা আলি কেনানের কাছে দোয়া নিতে আসে। আলি কেনান দোয়া করে কিন্তু ভেতরে ভেতরে ইঞ্জিনিয়ার বন্ধুর উপর ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়; এবং আলি কেনানের ব্যবহৃত কথ্য-ভাষার মধ্য দিয়ে না-বলা আরো অনেক কথা বোঝা যায়। এতদস্থলের কথ্য-ভাষা প্রয়োগশৈলির একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। যেমন:

> 'শালা খানকির বাচ্চা, খেয়াল রাখিস তুই কার জিনিসের উপর নজর দিছস। খুন কইর‍্যা ফেলামু। কইলজা টাইন্যা ছিঁড়্যা ফেলামু। শরীলের লউ খাইয়া ফেলামু। আজরাইলের নাহান জান কবজ কইর‍্যা ফেলামু। শালা পাটকাঠির মতন তর শরীর। তুই হেরে সামলাইতে পারবি না। তর চোখ দুইড্যা ট্যারা। তর কয় পয়সা আছে? তুই হেরে ছাইড়্যা দে।'[২৩]

প্রমিত বাংলা এবং আঞ্চলিক বাংলা এই দুই ভাষারীতিতেই আমরা মনের ভাব প্রকাশ করে থাকি। অফিস-আদালতে, স্কুল-কলেজে আমরা অনেকেই প্রমিত বাংলা ব্যবহার করি কিন্তু ঘরে এসে কথ্যভাষায় কথা বলতে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করি; এবং এই ভাষাতেই মনের ভাবটি সার্থকভাবে প্রকাশিত হয়। কথ্যভাষা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিকের মন্তব্য–

> 'নানারঙের উপভাষা বা আঞ্চলিকতায় পূর্ণতা পায় বাংলা ভাষা। এক সময় ধারণা করা হতো, শিষ্ট বা স্টান্ডার্ড ভাষাই বিশুদ্ধ আর আঞ্চলিক ভাষা বিকৃত বা অশুদ্ধ, কিন্তু সে ধারণার অবসান হয়েছে। ভাষার গুরুত্ব কীসে? আপাতত দুটি কথাই মাথায় আসছে। এক, ভাষা হলো কোনো এক জনগোষ্ঠীর মধ্যে ভাবের আদান-প্রদান বা তথ্য বিনিময় করার জন্য অনিবার্য এক মাধ্যম। এখানে আবেগ বা হৃদয়ের কোনো ব্যাপার নেই। ব্যবহারিক প্রয়োজনীয়তাটাই মুখ্য। আর দ্বিতীয় ব্যাপারটি হলো, সেই জনগোষ্ঠীর সংস্কৃতি, সাহিত্য, সংগীত, প্রকৃতি বা আবহাওয়াকে কাব্যিকভাবে প্রকাশের একটা মাধ্যম হলো ভাষা।'[২৪]

কথ্য-ভাষার মধ্যে যে কোনো ভাষার পরিপূর্ণ রূপ-সৌন্দর্য প্রকাশিত হয়। তাছাড়া মান-ভাষার চেয়ে কথ্য-ভাষাতে বক্তার বক্তব্য সুন্দর-সাবলীলভাবে দর্শক-শ্রোতার কাছে পৌঁছে যায়। 'একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন' উপন্যাসে আহমদ ছফা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মুখে আঞ্চলিক বা কথ্য-ভাষার সফল প্রয়োগ দেখিয়েছেন। এতে উপন্যাসে ভাষার গতিশীলতার সাথে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রগুলোর চারিত্র্য-বৈশিষ্ট্য পরিপূর্ণরূপে পরিস্ফুটিত হয়েছে; চরিত্রের মানস গঠন, আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে তার সামাজিক অবস্থান, ঘটনার সঙ্গে চরিত্রের সমন্বয় ও বিকাশ-সাধন–সব কিছুর মর্মমূলে রয়েছে কথ্য-ভাষার শিল্পসফল প্রয়োগ-প্রকৌশল। তাই এটি বলা যায়-আহমদ ছফার 'একজন আলী কেনানের উত্থান-পতন' উপন্যাসের সফলতার পেছনে কথ্য-ভাষার ভূমিকা অনস্বীকার্য।

তথ্যসূচি:

---

১ মুহম্মদ দানীউল হক, *ভাষাবিজ্ঞানের কথা*, (মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৭), পৃ. মুখবন্ধ অংশ

২ হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, (আগামী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৮), পৃ. ৮২

৩ রফিকুল ইসলাম (সম্পাদনা), *ভাষা ভাবনা*, (সাম্প্রতিক প্রকাশনী, বাসাবো, ঢাকা, ২০১২), পৃ. ১০৭

৪ রফিকুল ইসলাম (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১

৫ রফিকুল ইসলাম (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮

৬ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, *বাঙ্গালা ভাষার ইতিবৃত্ত*, (মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০২), পৃ. ৬২

৭ ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬২

৮ নূরুল আনোয়ার (সম্পাদনা), *আহমদ ছফা রচনাবলি* (প্রথম খণ্ড), (খান ব্রাদার্স এ্যান্ড কোম্পানি, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১৫), পৃ. ৩০

৯ হুমায়ুন আজাদ, *তুলনামূলক ও ঐতিহাসিক ভাষাবিজ্ঞান*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৩

১০ রফিকুল ইসলাম পবিত্র সরকার (সম্পাদনা), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, (বাংলা একাডেমি প্রেস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২), পৃ. ১৮৯

১১ মুহম্মদ দানীউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

১২ মুহম্মদ দানীউল হক, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪

১৩ আবুল কালাম মনজুর মোরশেদ, *আধুনিক ভাষাতত্ত্ব*, (মাওলা ব্রাদার্স, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০০৯), ২৬২

১৪ রফিকুল ইসলাম পবিত্র সরকার (সম্পাদনা), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১

১৫ নূরুল আনোয়ার (সম্পাদনা), *আহমদ ছফা রচনাবলি* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৬ নূরুল আনোয়ার (সম্পাদনা), *আহমদ ছফা রচনাবলি* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩

১৭ নূরুল আনোয়ার (সম্পাদনা), *আহমদ ছফা রচনাবলি* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩ ও ৪৪

১৮ হুমায়ুন আজাদ, *ভাষা শিক্ষা ও ভাষাবিজ্ঞান পরিচিতি*, (আগামী প্রকাশনী, বাংলা বাজার, ঢাকা, ২০১২), পৃ. ১০

১৯ রফিকুল ইসলাম পবিত্র সরকার (সম্পাদনা), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম খণ্ড)*, (বাংলা একাডেমি প্রেস, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০১২), পৃ. ২১৯

২০ রফিকুল ইসলাম পবিত্র সরকার (সম্পাদনা), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২০

[২১] রফিকুল ইসলাম পবিত্র সরকার (সম্পাদনা), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (প্রথম খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৪

[২২] রফিকুল ইসলাম পবিত্র সরকার (সম্পাদনা), *বাংলা একাডেমি প্রমিত বাংলা ভাষার ব্যাকরণ (দ্বিতীয় খণ্ড)*, প্রাগুক্ত, পৃ.১৮৭

[২৩] নূরুল আনোয়ার (সম্পাদনা), *আহমদ ছফা রচনাবলি* (প্রথম খণ্ড), প্রাগুক্ত, পৃ.৭২

[২৪] রিয়াদ খন্দকার, *আঞ্চলিকতার পূর্ণতায় আমার বাংলা ভাষা*, (দৈনিক ইত্তেফাক, ২০ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭), পৃ. ২১।